গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ২৭ মে - ৩ জুন, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সি এ জি রিপোর্টে এন ডি এ'র দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত

অপব্যয় ও আর্থিক কেলেঙ্কারীর ভয়াবহ নজির

সম্প্রতি ভারতের কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল (সি এ জি বা ক্যাগ) লোকসভায় যে রিপোর্ট পেশ করেছে তা তথাকথিত মূল্যবোধের প্রবক্তা বিজেপি পরিচালিত বিগত এন ডি এ সরকারের আমলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে লাগামহীন দুর্নীতি ও তছরুপ ঘটেছে তাকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি সংস্থাকে জলের দামে পছন্দের লোকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা, সড়ক উন্নয়নের কাজে শত শত কোটি টাকা তছরুপের ঘটনা, সরকারি তহবিল ভেঙে দলীয় প্রচার চালানোর ঘটনা, তেমনি রয়েছে মালিকদের হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা।

সি এ জি রিপোর্টে সরকারি সেন্টুর হোটেল বিক্রি নিয়ে দুর্নীতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দু'টি সরকারি সংস্থা 'জুহু সেন্টুর হোটেল' ও 'এয়ারপোর্ট সেন্টুর হোটেল' বিক্রি করা হয়েছে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই, অর্থাৎ মাত্র একজনের আবেদনের ভিত্তিতে। বলা হয়েছে, এয়ারপোর্ট সেন্টুরের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং ন্যূনতম দর ধার্য করার সময় যেভাবে এগোনো হয়েছিল, তা এই মন্ত্রক যেভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এগোতো তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। বিক্রির ব্যবস্থা করতে জুহু সেন্টুরের জন্য বারংবার ক্রেতাকে প্রথাবহির্ভূতভাবে বাড়তি সময় ও ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

সকলেরই স্মরণে আছে, এন ডি এ পূর্ববর্তী কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরসীমহা রাওয়ের নেতৃত্বে বিশ্বায়ন-উদারীকরণের অঙ্গ হিসাবে যে বিলগ্নীকরণ তথা বেসরকারীকরণ শুরু হয়েছিল, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ আমলে তা প্রবল গতি পায়। এমনকী বিজেপি বিলগ্নীকরণের জন্য আলাদা একটি মন্ত্রক খোলে এবং সেই বিলগ্নীকরণ মন্ত্রকের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন অরুণ শৌরি। মন্ত্রী হিসাবে অরুণ শৌরির ভূমিকা এই কেলেঙ্কারিতে সরাসরি যুক্ত বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০২ সালের মার্চে অনেক কম দামে মাত্র ১৫৩ কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয় জুহু সেন্টুর হোটেল। অথচ এই হোটেলের সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছিল ২৪৫ কোটি টাকা। এয়ারপোর্ট সেন্টুর হোটেল বিক্রি করা হয় ৮৩ কোটি টাকার বিনিময়ে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জুহু সেন্টুরের জন্য ২০টি এবং এয়ারপোর্ট সেন্টুরের জন্য ২১টি টেন্ডার গ্রহণ করা হয়। জুহু সেন্টুরের ক্ষেত্রে তিনটি টেন্ডার বাতিল হয়ে যায় এবং যোলটি সংস্থা নিজেরাই সরে যায়। থেকে যায় শুধু টিউলিপ হসপিটালিটি সার্ভিসেস। এয়ারপোর্ট সেন্টুরের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটে। চারটি টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়, ১৩টি সংস্থা সরে যায়। চারটি সংস্থা মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত থাকলেও শেষপর্যন্ত থাকে একটি মাত্র সংস্থাই — বাতরা হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড। এই সংস্থাগুলিকে শুধু যে কম দামে হোটেলগুলি বিক্রি করা হয়েছে তাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা ধরনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই সংস্থাগুলির মালিক বিজেপি'র দুই নেতা। সি এ জি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই লোকসভায় বিরোধীরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন।

বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি 'ভারত উদয়ে'র নামে তাদের সাফল্যের কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে আত্মপ্রচারের যে জৌলুষ ছড়িয়েছিল, সি এ জি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, তার জন্য ৬৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা অবৈধভাবে সরকারি তহবিল থেকে খরচ করা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই টাকা খরচে সংসদের কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। অথচ এক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন ছাড়া এভাবে অন্য খাতের টাকা খরচ করা যায় না।

এন ডি এ আমলে মালিকদের অবৈধভাবে বহু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকার যখন কথায় কথায় টাকার অভাবের অজুহাত তোলে এবং সেই অজুহাতে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্যে সরকারি বরাদ্দ ছাঁটাই করে দেয়, পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি বন্ধ করে দেয় তখন সি এ জি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, এন ডি এ'র আমলে প্রত্যক্ষ কর খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট যে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ১০৬ কোটি টাকা আদায় করার কথা ছিল, তার মধ্যে ৮৮ হাজার কোটি টাকার মতো প্রত্যক্ষ কর সরকার আদায় করেনি। এর মধ্যে ৫৭ হাজার কোটি টাকা আগের বছরগুলি থেকে অনাদায়ী ছিল, ২০০৩-'০৪ সালেই বাকি পড়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা। এই প্রত্যক্ষ করের টাকা মূলত মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা।

সি এ জি রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, রপ্তানিতে উৎসাহ দিতে সরকার রপ্তানিকারী বিভিন্ন সংস্থা ও মালিকদের ৩৯ হাজার ৭০৪ কোটি টাকার আমদানি শুল্ক ছেড়ে দিয়েছে। রপ্তানিকারীদের কাছ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বকেয়া শুল্ক আদায়েও সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে রিপোর্টে।

উৎপাদন শুল্কের ব্যাপারেও অনেক গরমিল নজরে এসেছে সি এ জি'র। ৫৪ হাজারের বেশি ঘটনায় ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শুল্ক আদায় চূড়ান্ত হয়নি। ওই খাতে সরকারের প্রাপ্য ছিল ২৩ হাজার ২৭৫ কোটি টাকারও বেশি। উৎপাদন শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৯৬

আটের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- ভ্যাটের বিরুদ্ধে কনভেনশন
- কমরেড স্ট্যালিনের যে ভাষণ সমাজতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল
- কাকদ্বীপ কনভেনশন
- বিশ্বব্যাঙ্কের করাল গ্রাসে বাংলাদেশ
- আন্দোলন সংবাদ

ডি এ ফেরত কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া

রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনে ২ মে একটি সংগ্রামী গৌরবোজ্জ্বল দিন রূপে চিহ্নিত হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদিন হাজার হাজার রাজ্য সরকারি কর্মচারী ভিক্ষার দান স্বরূপ সরকারের দেওয়া ৩ শতাংশ ডিএ'র টাকা মানিঅর্ডার করে সরকারকে ফেরত দেওয়ার কর্মসূচিতে উৎসাহের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

মুখে কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে করতে রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যখন কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণ করছে, কর্মচারীদের ভিআরএস, ইআরএস নিতে বাধ্য করছে এবং সর্বশেষ কালা রি-ডিপ্লয়মেন্টের আদেশনামার দ্বারা কর্মচারীদের

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার যা করছে, দিল্লিতে শীলা দীক্ষিতের সরকারও তাই করছে। বুদ্ধদেববাবুরা পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন বলতে যেমন কিছু উড়ালপুল নির্মাণ, বস্তি উচ্ছেদ বুঝিয়ে থাকেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ ও জনগণের উপর নতুন নতুন কর ধার্য করাকে উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত মনে করেন, তেমনি দিল্লিতে কংগ্রেস সরকারও তাই করছে। পশ্চিমবঙ্গের মতই দিল্লিতেও সরকারের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে এস ইউ সি আই।

দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই জলের উপর কর বসিয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পরিবহণের সমস্যাও ভয়াবহ। দিল্লিকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে ধরার কথা বলে বস্তি উচ্ছেদ করা হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিল্প কলকারখানা বন্ধ, ভয়াবহ বেকার সমস্যা। ভ্যাট মূল্যবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজধানীতে নারীর নিরাপত্তা নেই — খুন, ধর্ষণ ব্যাপক। সরকার নির্বিকার।

এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে এক নাগরিক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রায় তিন মাস ধরে দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, এলাকায় এলাকায় বৈঠক, পথসভা প্রভৃতি কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে পালনের মধ্য দিয়ে সমস্যা জর্জরিত মানুষকে সংগঠিত করা হয়।

১৮ মে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচী ছিল। এদিন দুপুরে খরতাপ উপেক্ষা করে

আটের পাতায় দেখুন

পশ্চিম মেদিনীপুর

বেলদা বিডিও অফিসে অবরোধ

নয়া পঞ্চায়েত কর প্রত্যাহার, ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ফসলের ন্যায্য দাম, রেশন ও বিপিএল কার্ড প্রদান, কেলেঘাই নদী সংস্কার, বেলদা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা, বেলদাকে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা, বেলদা-দীঘা রেলপথ স্থাপন, বেলদা-হাওড়া বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেন চালু সহ নারায়ণগড় ব্লকের সার্বিক উন্নয়নের ১৪ দফা দাবি নিয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর এস ইউ সি আই এবং অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নারায়ণগড় ব্লক কমিটির ডাকে গত ৬ মে এক সুসজ্জিত মিছিল বেলদা বিডিও অফিসে যায়। আগে জানানো সত্ত্বেও বিডিও উপস্থিত না থাকায় মিছিলকারীরা বিডিও অফিসের গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয়ে অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ ধাক্কা দিতে থাকে, কিন্তু উত্তেজিত জনতার প্রবল প্রতিরোধের সামনে পুলিশ পিছু হটে। শেষপর্যন্ত বিডিও ডেপুটেশন নেওয়ার জন্য বিক্ষোভকারীদের কাছে হাজির হতে বাধ্য হন। কিছু কিছু দাবি তিনি সমাধানের আশ্বাস দেন এবং বিক্ষোভকারীদের সামনে বক্তব্য রাখতে বাধ্য হন। বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস তুষার জানা, শচীন মাইতি, অহীন পাত্র, স্বদেশ পড়্যা প্রমুখ। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড সূর্য প্রধান।

রাঁচিতে পানীয় জলের জন্য হাহাকার

এস ইউ সি আই আন্দোলনের পথে

রাঁচি সহ গোটা ঝাড়খন্ডে জলের জন্য হাহাকার চরমে পৌঁছেছে। অন্য জায়গার কথা ছেড়ে দিলেও শুধু রাজধানী রাঁচিতেই শতকরা ৯০ ভাগ এলাকাতে ভীষণ জলকষ্টে ভুগছে সাধারণ মানুষ। শতকরা ৯৫ ভাগ নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যে দু-একটি এখনও ভাল আছে, তাতে শত শত মানুষ বালতি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে। সকালে পাইপলাইনে যেখানে জল আসে সেখানে রাত থেকেই শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে। এই জলের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে বাচ্চাদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়েছে। প্রতিদিন জলের লাইনে ঝগড়া-মারপিট হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই মারপিটে ১ জনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। আহত হয়েছে কয়েকজন। এমতাবস্থায় ঝাড়খন্ডের বিজেপি সরকার জনজীবনের এই চরম দুর্দশার প্রতি উদাসীন। তারা কোনরকমে মন্ত্রীত্ব টিকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেছেন — ''জলের সমস্যা গোটা পৃথিবীতেই আছে। এ নিয়ে এত হৈচৈ করার কী আছে ?''

সাধারণ মানুষের যখন এই অবস্থা তখন তার বিপরীতে বড় লোকদের ঘরে বা এলাকায় এবং বড় হোটেলগুলিতে জলের অফুরন্ত সরবরাহ চলছে। সাধারণ মানুষ যখন একফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করছে তখন বিজেপি সরকারের এক মন্ত্রীর বাড়িতে প্রতিদিন এক ট্যাঙ্কার জল যাচ্ছে, তাঁর সাধের ফুলের বাগানে জল দেওয়ার জন্য।

এমতাবস্থায়, রাঁচি জেলা এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে জলের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মিটিং করা, গণকমিটি গঠন করা, বিভিন্ন সরকারি অফিসারদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া, রাঁচি মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিসি-র সাথে কথা বলে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সুফল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে।

এই আন্দোলনেরই অঙ্গ হিসাবে গত ১৪ মে দলের রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে কাছারি চক থেকে একটি মিছিল বের করা হয় এবং এলবার্ট এক্কা চকে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার কুশপুতুল দাহ করা হয়। মিছিলের প্রথমে ব্যানারে লেখা ছিল 'জনতা প্যাসী হ্যায়, পানী দো'। মিছিলে স্লোগান ওঠে 'রাঁচির জন্য নির্ধারিত ৪৪ কোটি টাকা কোথায় গেল ?' 'মন্ত্রীদের জন্য এ সি গাড়ি কেনার ১৫ লাখ টাকা সরকারের আছে, কিন্তু জলের জন্য টাকার অভাব কেন ?' 'যেখানে খাবার জলই নেই, সেখানে উন্নয়নের কথা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়' ইত্যাদি। কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি।

মুর্শিদাবাদ

এ আই ডি এস ও'র বিক্ষোভ মিছিল শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও ডোনেশান প্রথার বিরুদ্ধে, ভর্তি সমস্যার সমাধান এবং ভাঙন-দুর্গত এলাকার অনাহারপীড়িত ছাত্রছাত্রীদের ফি-মকুব ও বিনা পয়সায় সরকারি উদ্যোগে বই সরবরাহ সহ ১১ দফা দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন স্তরে স্তরে সংগঠিত হয়। গত ১৮ মে বহরমপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়। বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজের সামনে থেকে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর একটি স্লোগান মুখরিত সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে ডি আই অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সেখান থেকে দু'টি প্রতিনিধি দল ডি এম এবং ডি আইকে ডেপুটেশন দিতে যায়। বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড অনুপ সিন্‌হা। সেখান থেকে মিছিল ডি এম অফিস হয়ে ফৌজদারী কোর্টের সামনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। স্লোগানের দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়ে শত শত মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন। কার্যত জনবহুল ঐ রাস্তাটি আধ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কুশপুত্তলিকায় অগ্নি সংযোগ করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ মণ্ডল। ডি আই দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ যাতে সরকার নির্ধারিত ফি নেয় তার জন্য সার্কুলার দেওয়া হবে বলে ডি আই দপ্তর থেকে জানানো হয়। ডি এম না থাকায় এ ডি এম ডেপুটেশন নেন। উল্লেখ্য জেলায় বিভিন্ন স্কুলে যথেচ্ছ ফি আদায় করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। হরিহরপাড়ার বিহারিয়া হাইস্কুলে ডি এস ও ঘেরাও আন্দোলন করে দাবি আদায় করে। ঐ স্কুলে ফি-ডোনেশন মিলিয়ে ১৫০ টাকা আদায় করা হচ্ছিল। আন্দোলনের ফলে ৪৭ টাকা ফি নিয়ে ভর্তি করা হয়। ঐ থানারই গোবিন্দপুর হাইস্কুলে মোট ২৫০ টাকা ফি নেওয়ার বিরুদ্ধে ডি এস ও ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখার পর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে তা পূরণের আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। সেখানে ৫৬ জন অভিভাবক নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দার্জিলিং

এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনে বাড়তি টাকা নেওয়া বন্ধ করল স্কুল

বামফ্রন্ট শাসনে অবৈতনিক শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিগত ২৮ বছরে সরকার নির্ধারিত ফি বহুবার বর্ধিত হয়েছে। এর উপর সরকারি প্রশ্রয়ে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় অবৈধভাবে ডোনেশন আদায় করে চলেছে। শিলিগুড়ি ভারতী হিন্দী হাইস্কুলে এ বছর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি ফি বাবদ ১০০০ টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে এ আই ডি এস ও দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। গত ১৪ মে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে সরকার নির্ধারিত ফি'তে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর ভর্তি দাবি করা হয়।

স্কুলে বেআইনি ডোনেশন আদায়কে কেন্দ্র করে কায়েমী স্বার্থবাদী গ্রুপ তৈরি হয়েছে। ডেপুটেশন দেওয়ার সময় তারা আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয়। তারা কতিপয় ছাত্রকে বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টাও করে। কিন্তু তাদের এই ন্যক্কারজনক আচরণের প্রতি ধিক্কার জানান স্থানীয় মানুষ। আন্দোলনকারীদের অদম্য সাহস ও মনোবল দেখে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন অভিভাবকেরা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৬ মে আবার ডেপুটেশন আন্দোলনে অভিভাবকদের অংশগ্রহণের ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ডোনেশন নেওয়া থেকে সরে আসেন এবং অভিভাবকেরা যে যা দিতে পারবেন তা নিতেই সম্মত হন। অভিভাবকেরা জানিয়ে দেন, দেড়শো থেকে দুশো টাকার বেশি তাঁরা দিতে পারবেন না। এবং তার ভিত্তিতেই ভর্তি শুরু হয়। আন্দোলনের এই সাফল্য গরিব ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

নাগরিক কনভেনশনে ভ্যাটের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান

গত ১৬ মে কলকাতায় ভ্যাটবিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভ্যাট আইন সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত 'এমপাওয়ার্ড কমিটি'-র চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বোঝাতে চাইছেন, ভ্যাট চালু হলে জিনিসপত্র, পরিষেবা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম কমে যাবে। এর দ্বারা কাঁচামাল উৎপাদক থেকে সর্বশেষ উৎপাদক কম দামে পণ্য পাবেন, অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই সুবিধা পাবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, ছোট ব্যবসায়ী ও কিছু প্রয়োজনীয় পণ্যকে এই ভ্যাটের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁর দাবি — ভ্যাট হল একটি সার্বিক কল্যাণকর ব্যবস্থা। মন্ত্রীর এই বক্তব্য একটি কৌশলী মিথ্যা প্রচার এবং পরিসংখ্যানের কারচুপি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রথমত, যেসব ছোট ব্যবসায়ী — যাঁদের ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়েছে তাঁদেরও খাতাপত্র প্রতিদিন তৈরি বা আপ-টু-ডেট করে রাখতে হবে এবং তাঁদের বিক্রি বা 'টার্ণ ওভার' - হিসাব দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁরা ছোট ব্যবসায়ী। আর যাঁরা ভ্যাটের আওতায় আসবেন তাঁদের ছোট-বড় সব পণ্যের ইন্‌পুট ট্যাক্সের রসিদ বা ইন্‌ভয়েস্ রাখতে হবে এবং সরকারি দপ্তরে জমা দিয়ে তা ফেরত পাবার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর ফলে একদিকে যেমন বহু আইনি জটিলতা বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে ভ্যাট জমা দেওয়া ঠিক মত হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে তা তাঁদের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে। তার ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে বা 'ইন্সপেক্টর রাজ' কায়েম হবে। ছোট-মাঝারি সকলশ্রেণীর ব্যবসায়ী ভ্যাটের হিসাবপত্র, খাতা তৈরি, হিসাব পরীক্ষা, প্রশাসনিক ছাড়পত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকতে বাধ্য হবেন। এর ফলে তাঁদের খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং এই খরচ তাঁরা ক্রেতাদের কাছ থেকে উশুল করে নেবেন।

দ্বিতীয়ত, আগে পণ্যের যে সর্বোচ্চ মূল্য বা এম আর পি ধার্য ছিল তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্রয় কর যুক্ত করা থাকতো। ছোট ব্যবসায়ীরা তার থেকে কিছু কম দামে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করতে পারতেন কিন্তু বর্তমানে মূল্য এবং কর আলাদা হয়ে যাওয়ায় ক্রেতাকে বা সাধারণ মানুষকে সর্বোচ্চমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, রান্নার গ্যাস প্রভৃতি যেসব পণ্য সরকার পরিচালনাধীন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে দাম সামান্য কমেছে এবং কয়েকটি ওষুধ যাদের করের পরিমাণ ৬ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোথাও একটু কমেছে বা একই আছে। এছাড়াও জনসাধারণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার চাপে কিছু ভোগ্যপণ্যকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখতে সরকার বাধ্য হয়েছে। এসব দেখিয়ে সরকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে যে ভ্যাটের ফলে দাম কমবে। উল্লিখিত পণ্যগুলি যে, পরবর্তীকালে ভ্যাটের আওতায় আসবে না, সরকার এবিষয়ে কোন গ্যারান্টি দেয়নি। যেমন কয়েকটি ওষুধে সরকার কর-ছাড় দিলেও বেশিরভাগ ওষুধে, এমনকী বহু জীবনদায়ী ওষুধ যা আগে বিক্রয়কর মুক্ত ছিল সেসবকে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে এবং পেস্‌মেকার ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সহ সমগ্র ঔষধ শিল্প ও পরিষেবাকে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে চিকিৎসার সর্বক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে ও তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, এই করনীতির মূল উদ্দেশ্য হল দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিকে আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে ঢালাও কর ছাড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বিপুল পরিমাণ কর ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও আয়কর, কোম্পানি কর, আমদানি কর, অন্তঃশুল্ক বাবদ এক লক্ষ কোটি টাকার ওপর তাদের কাছে সরকারের পাওনা রয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং দেশি-বিদেশি এই বৃহৎ গোষ্ঠী থেকে যে কর আদায় হত তা ছিল জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ। বর্তমানে তা কমতে কমতে ২০০৪ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিকে ছাড় দেওয়ার ফলে জিডিপি'র ৬ শতাংশ, টাকার অঙ্কে এক লক্ষ একান্ন হাজার চৌদ্দ কোটি টাকা, যা কর থেকে রাজস্ব আদায় হত, তা কমে গেল। এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যই কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সবরকমের পণ্যকে করের আওতায় নিয়ে আসাই হল সরকারের ভ্যাট চালু করার লক্ষ্য। আসলে ভ্যাটের মধ্য দিয়ে দেশি-বিদেশি বৃহৎ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই সরকার এই করব্যবস্থার মাধ্যমে একপ্রকার ক্রস-সাবসিডি দিতে চলেছে। এর ফলে জনসাধারণের সমস্ত অংশের মানুষকে সরকার করের আওতার মধ্যে এনে ফেলার চেষ্টা করছে। 'ভ্যাট' — যা একটি পরোক্ষ কর, তার বোঝা অন্য কেউ নয়, প্রান্তিক ও সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হয়; আর এইভাবেই সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিদের ছাড় দেওয়া বিরাট অঙ্কের করের পরিমাণ সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। এরদ্বারা বহু ত্রুটি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির যতটুকু আর্থিক স্বাধিকার অবশিষ্ট ছিল তা সঙ্কুচিত হবে। রাজ্যগুলি আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পণ্যে যে ভিন্ন মাশুলনীতি ছিল, যার দ্বারা তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কখন কখন কোন পণ্যের দাম কমিয়ে রাখতো, বর্তমানে মাশুল সমীকরণের ফলে সে সুযোগ আর রইল না। গোটা দেশে সর্বত্র একই ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে — বিপরীতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

১ এপ্রিল পাটনায় ভ্যাটের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভ্যাটব্যবস্থা বিশ্বের নানা দেশে প্রচলিত থাকলেও তার অন্ধ অনুকরণ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ভালো হতে পারে না। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও তথ্য যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ, কানাডা, ব্রাজিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান তারা আজও করতে পারেনি। ভারতের ক্ষেত্রেও বহু জরুরি প্রশ্নকে অমীমাংসিত রেখেই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সমস্ত দিক বিচার না করে রাজস্ব বাড়াবার উৎসাহে ভ্যাট চালু করার জন্য সরকারের এই অতি তৎপরতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

প্রস্তাবে অবিলম্বে যেকোন মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বন্ধ করার জন্য, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করা ও আশঙ্কা দূর করার জন্য জানানো হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। সম্মেলন থেকে ভ্যাট চালু করার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাবার সাথে সাথে 'ভ্যাটে'র বিরুদ্ধে সর্বত্র মিটিং-মিছিল-আলোচনা সভা-কনভেনশন-সিম্পোসিয়াম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনমত সংগঠিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এম এস এসের নদীয়া জেলা সম্মেলন

১৪-১৫ মে কালীগঞ্জ থানার মীরাবাজারে নদীয়া জেলা তৃতীয় মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মে পলাশী ঘোষপাড়া মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধানবক্তা, এম এস এসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, যতদিন এই সমাজ নারীকে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি না দেবে ততদিন নারীমুক্তি সম্ভব নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা শোষণ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ — এই দুই শোষণের বোঝা নারী সমাজ বহন করে চলেছে। রাষ্ট্র দ্বারা এই শোষণের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং এর মধ্য দিয়েই নারীমুক্তি সম্ভব। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় প্রতিটি নারীকে আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তিতে মাথা উঁচু করে সাহসের সাথে নিজেদের সমস্যা থেকে মুক্তির সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড শেখ খোদাবক্স বলেন, সমাজে মহিলারা কেউ মা, কেউ বোন বা কেউ কন্যা। ফলে তাঁদেরকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সমস্ত পুরুষকে উদ্যোগ নিতে হবে। আবার নারীদেরও নিজেদের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। প্রায় ৭ শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরু হওয়ার আগে এক বিশাল মহিলা মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। প্রকাশ্য সমাবেশে সভানেত্রী ছিলেন বিদায়ী জেলা সম্পাদিকা কমরেড স্বপ্না দাশগুপ্ত। এই সমাবেশ দলমত নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

১৫ মে মীরা হাইস্কুলে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার কাজ পরিচালনা করেন বিদায়ী জেলা সম্পাদিকা কমরেড স্বপ্না দাশগুপ্ত। ৭৫ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে কমরেড বাতশোভা বেগমকে সভানেত্রী, কমরেড বরুণা দাশগুপ্তকে সম্পাদিকা ও কমরেড লক্ষ্মী মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৩ সদস্যের জেলা কমিটি এবং ২৪ সদস্যের কাউন্সিল গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং-এর বিরুদ্ধে

কর্পোরেশনে মহিলাদের বিক্ষোভ

অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও হোর্ডিং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে গত ১০ মে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে কলকাতা কর্পোরেশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

পুলিশ কর্পোরেশনের গেটের সামনে অবস্থান করতে না দেওয়ায় মহিলারা চ্যাপলিন সিনেমা হলের কাছে রাস্তায় বসে পড়েন এবং সেখানেই বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর ও সভানেত্রী ভারতী রায় সহ কমরেডস্ অতসী মুখার্জী, রুণা পুরকাইত, সুজাতা সেন, শীলা ভক্ত এবং অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, অশ্লীলতা প্রচারের ফলে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়ছে যেমন খুশি জীবনযাপন করার প্রবণতা। নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধ্বংস হচ্ছে। বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা, খুন-ধর্ষণ-গণধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিলম্বে এ জিনিস বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবস্থান থেকে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়।

পিতৃভূমি রক্ষার এই যুদ্ধে ভয় কাকে বলে

১৯৪১ সালের ৩ জুলাই

[১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের ফ্যাসিস্ট জার্মান সেনার ১৭০টি ডিভিশন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ১৯৩৯ সালে জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ চুক্তি জার্মানি হেলায় দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়। অতর্কিত ভয়াবহ আক্রমণে জার্মান বাহিনী দ্রুত ঢুকে আসতে থাকে। দেশের এই গভীর বিপদকে কীভাবে সোভিয়েট লালফৌজ প্রতিরোধ করবে, সোভিয়েট জনগণের ভূমিকা কী হবে, শেষপর্যন্ত দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করা কি সম্ভব হবে — এইসব প্রশ্ন যখন সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্বের জনগণকে আলোড়িত করছে, সে'সময় আক্রান্ত হওয়ার ১০দিনের মাথায় ১৯৪১ সালের ৩ জুলাই মহান নেতা কমরেড জে ভি স্ট্যালিন সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসাবে এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তাঁর এই ভাষণ ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ, যার মর্মবস্তু, ভাষা ও উপস্থাপনা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কীভাবে এই একটি ভাষণ গোটা সোভিয়েট জনগণকে আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা নিয়ে বহু কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। মানবসভ্যতাকে রক্ষার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সোভিয়েট জনগণের আত্মত্যাগ এক বিশ্বজনীন আবেদন নিয়ে সাহিত্যেরও বিষয় হয়েছে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো একটির পর একটি যখন হিটলার বাহিনীর কাছে পদানত হয়েছে, তখন মহান স্ট্যালিন তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, সোভিয়েট জনগণের দ্বারা জার্মান বাহিনী পরাজিত হবে। বহু অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে সোভিয়েট জনগণ নেতার এই আস্থা ও বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৬০ বছর উপলক্ষ্যে এই ভাষণটি প্রকাশ করা হল।]

আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা, নাগরিক ও কমরেডগণ, আমাদের সেনা ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা, আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলছি।

বিশ্বাসঘাতক হিটলারপন্থী জার্মানি আমাদের পিতৃভূমির উপর গত ২২ জুন যে সামরিক আক্রমণ শুরু করে, তা এখনও চলছে।

লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে পড়ে যদিও শত্রুসেনার শ্রেষ্ঠ ডিভিশনগুলি, সেরা বিমানবহর ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে তারা ব্যর্থতার মুখে পড়েছে, তবুও নতুন নতুন বাহিনীকে আক্রমণে এনে শত্রুরা আমাদের দেশের ভিতর ঢুকে আসছে।

হিটলার বাহিনী লিথুয়ানিয়া দখল করতে সফল হয়েছে, লাতভিয়ার একটা বড় অংশ, পশ্চিম বেলারুশ ও ইউক্রেনের পশ্চিম অংশ দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট বিমানবহর আক্রমণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করছে। মুর্মানস্ক, ওরশা, মগিলেভ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওডেসা ও সিবাস্তিপোলের ওপর তারা বোমাবর্ষণ করে চলেছে।

দেশের সামনে আজ গভীর বিপদ। আমাদের মহান লালফৌজ থাকা সত্ত্বেও এতগুলি শহর এবং জেলা কীভাবে ফ্যাসিস্ট সেনার হাতে চলে গেল, কী করে এটা ঘটতে পারল? উদ্ধত ফ্যাসিস্ট বাহিনী সর্বদা সোচ্চারে যেটা প্রচার করে থাকে, তবে কি সেটাই সত্য? জার্মান বাহিনী কি সত্যই অপরাজেয়? না, তা অবশ্যই নয়।

ইতিহাস আমাদের দেখায় — কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়। অতীতেও ছিল না, এবং আজও নেই। নেপোলিয়ানের বাহিনীকে অপরাজেয় মনে করা হয়েছিল, কিন্তু রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও জার্মান সেনাবাহিনীর হাতে তাকে বার বার পরাজয় মানতে হয়েছিল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় কাইজার উইলহেলমের সেনাবাহিনীকে অপরাজেয় বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু তাকেও বারবার রুশ ও ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর হাতে পরাজিত হতে হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী তাকে ধ্বংস করে দেয়।

বর্তমানে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীরও একই পরিণতি ঘটবে। এখন ইউরোপের মাটিতে তারা কোন দৃঢ় প্রতিরোধের সামনে পড়েনি। একমাত্র আমাদের দেশের মাটিতেই তাদের যথার্থ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। এবং লালফৌজের এই প্রতিরোধের আঘাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সবচেয়ে সেরা ডিভিশনগুলিকে পরাজয় মানতে হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, এই সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করা সম্ভব এবং বাস্তবেও এদের দশা হবে নেপোলিয়ন এবং উইলহেলমের বাহিনীর মতোই। এসত্ত্বেও ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের খানিকটা জার্মানরা যে দখল করতে পেরেছে, তার কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময়টা ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে অনুকূল এবং সোভিয়েট শক্তির পক্ষে প্রতিকূল। বাস্তব ঘটনা হল, ইতিমধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত দেশ হিসাবে জার্মানি পূর্ণ সৈন্য সমাবেশ করেই রেখেছিল। আক্রমণ চালাবার জন্য যে ১৭০টি জার্মান ডিভিশনকে সোভিয়েট সীমান্তে নিয়ে আসা হয়, তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তৈরিই ছিল, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শুধু একটা সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিল। অথচ সোভিয়েট সেনাবাহিনীর তখনও শক্তিসমাবেশ ঘটাতে ও সীমান্তে পৌঁছাতে বাকি ছিল। এ প্রসঙ্গে অপর একটি ঘটনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানি যে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই চুক্তি তারা লঙ্ঘন করেছে। এজন্য বিশ্বের চোখে জার্মানি হানাদার রূপে চিহ্নিত হবে একথা জেনেও চুক্তি লঙ্ঘন করতে তাদের আটকায়নি।

আমাদের দেশ শান্তি চায়, চুক্তি লঙ্ঘনে আমরা অগ্রণী হতে চাইনি, বিশ্বাসঘাতকতার পথে যাইনি। প্রশ্ন উঠতে পারে, হিটলার এবং রিবেনট্রপের মতো বিশ্বাসঘাতক শয়তানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে কেন সোভিয়েট সরকার মত দিয়েছিল? এটা কি সোভিয়েট সরকারের ভুল ছিল না? না, কখনই তা ভুল নয়। অনাক্রমণ চুক্তি হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি। ১৯৩৯ সালে এই চুক্তির প্রস্তাব জার্মানিই আমাদের দিয়েছিল।

সেই প্রস্তাব কি সোভিয়েট সরকার প্রত্যাখ্যান করতে পারত? আমি মনে করি, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব কোনও শান্তিকামী দেশই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, এমনকী প্রতিবেশী দেশের সরকারি ক্ষমতার শীর্ষে হিটলার ও রিবেনট্রপের মতো নরখাদক শয়তান থাকলেও নয়। এক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত একটাই, তা হল, চুক্তি কোনমতেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শান্তিকামী দেশের ভৌগোলিক সংহতি, স্বাধীনতা ও সম্মানের হানি ঘটাবে না। সকলেই জানেন, সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এ'ধরনেরই একটা চুক্তি।

জার্মানির সঙ্গে এই অনাক্রমণ চুক্তি করায় আমাদের লাভ কী হয়েছে? এর ফলে দেড় বছর আমরা শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আক্রমণ চালাবার ঝুঁকি যদি ফ্যাসিস্ট জার্মানি নেয়, সেকথা ভেবে রেখে তা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ আমরা পেয়েছি। এভাবেই চুক্তির মধ্য দিয়ে কিছু নিশ্চিত সুবিধা আমরা পেয়েছি, যেটা বিপরীতে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে নিশ্চিত অসুবিধার কারণ হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকের মতো চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে সোভিয়েট ইউনিয়নে হানাদারি চালিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি কী লাভ করেছে এবং ক্ষতিই বা তার কী হয়েছে?

এর দ্বারা অল্পসময়ের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় নিজের সৈন্য সমাবেশের সুযোগ জার্মানি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু গোটা দুনিয়ার চোখে নিজের রক্তপিপাসু হানাদার চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সামরিক দিক থেকে জার্মানির লাভটুকু নেহাতই একটা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। অন্যদিকে যে প্রবল রাজনৈতিক লাভ সোভিয়েট ইউনিয়নের হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী, যেটা ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগামী দিনে লালফৌজের সামরিক বিজয়ের জমি তৈরি করে দেবে।

এই কারণেই, আমাদের বীর লালফৌজ, আমাদের বীর নৌবাহিনী, আমাদের সদাতৎপর বিমানবাহিনীর সকলে, দেশের সমগ্র জনগণ, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার সুসন্তানেরা এবং জার্মানিরও শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ সকলে জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করছে। তারা সোভিয়েট সরকারের পাশে থাকছে, সোভিয়েট সরকারের আচরণকে সমর্থন করছে। তারা দেখছে, আমরা ন্যায়ের জন্য লড়ছি। তারা বুঝেছে — শত্রুর পরাজয় অনিবার্য, জয় আমাদের হবেই।

আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধের পরিণামে চরম সোভিয়েটবিদ্বেষী এবং চূড়ান্ত প্রতারক জার্মান ফ্যাসিবাদের মৃত্যুশীতল বজ্রমুষ্টির কবলে আমাদের দেশ পড়েছে। ট্যাঙ্ক এবং জঙ্গি বিমানে সুসজ্জিত ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনী অমিত শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করছে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বহু আত্মদানের মধ্য দিয়ে লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনী প্রতি ইঞ্চি সোভিয়েট ভূমির জন্য মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানে সজ্জিত লালফৌজের মূল শক্তি এখন যুদ্ধে নামছে। লালফৌজের সৈনিকরা বীরত্বের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করছে। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সবদিক থেকে আরও জোরদার হচ্ছে।

লালফৌজের সাথে সাথে সমগ্র সোভিয়েট জনগণ স্বদেশ রক্ষার আহ্বানে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেশের এই গভীর বিপদকে প্রতিহত করার জন্য, শত্রুকে পুরোপরি ধ্বংস করার জন্য আমাদের কী কী করা দরকার ?

সর্বাগ্রে আমাদের দেশের জনগণ, সোভিয়েট জনগণকে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে দেশের সামনে বিপদ কত গভীর। সমস্ত আত্মসন্তুষ্টি, সবরকম অসতর্কতা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজের যে মানসিকতা, যা যুদ্ধের আগে স্বাভাবিক ছিল, তা পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ যুদ্ধ সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, এখন পূর্বেকার ঐ মানসিকতা পরাজয় ডেকে আনতে পারে।

শত্রু নির্মম এবং দুর্দম। তার লক্ষ্য — আমাদের দেশ দখল করা, আমাদের ঘামে ভেজা মাটি, আমাদের শস্য, আমাদের শ্রমে সৃষ্ট তৈলসম্পদ দখল করা। শত্রুর উদ্দেশ্য, সামন্তপ্রভুদের শাসন ফিরিয়ে আনা, আবার জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। রুশ, উক্রাইনীয়, বেলারুশ, লিথুয়ানীয়, লাতভীয়, এস্তোনীয়, উজবেক, তাতার, মোলডাভীয়, জর্জিয়, আর্মেনীয়, আজারবাজানীয়, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য মুক্ত জনগোষ্ঠীর স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে তারা ধ্বংস করতে চায়। তাদের জার্মানির অধীনস্থ করতে, জার্মান ব্যারন ও প্রিন্সদের দাসে পরিণত করতে চায়।

কাজেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের কাছে এটা জীবনমরণ প্রশ্ন। সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ স্বাধীন থাকবে, নাকি দাসত্বের জোয়ালে বাঁধা পড়বে — এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হবে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য সোভিয়েট জনগণকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে এবং

১২ মে বিদ্যুতের মূল্যহ্রাস ও বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে অ্যাবেকার পথ অবরোধ। পরে বিদ্যুৎগ্রাহকরা আইনঅমান্য করেন।

নদীয়া

চাপড়ায় ছাত্র আন্দোলনের জয়

নদীয়া জেলার চাপড়া মেরী ইমাকুলেট গার্লস হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কাছ থেকে একটি করে ডায়েরি দিয়ে ১৫০.০০ টাকা আদায় করছিল এবং জুন মাসে ডোনেশন সহ সেশন চার্জ ১৯০.০০ টাকা নেবে বলে ঘোষণা করেছিল। এতে ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেশন চার্জ কম নেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেননি। তখন তাঁরা ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র নেতৃত্বকে বিষয়টা জানান। পরদিন ১৬ মে ডি এস ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সিকান্দার আলির নেতৃত্বে ২ জন অভিভাবক সহ ৭ জনের প্রতিনিধি দল স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন দেয়। কর্তৃপক্ষ ডি এস ও'র দাবি মেনে নেয় এবং ডায়েরির দাম কমিয়ে ৫০ টাকা এবং সেশন চার্জ ৭০ টাকা করে। আন্দোলনের এই জয়ে ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েট জনগণকে তা ভুলতে হবে

মহান স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক বেতার ভাষণ

সবরকম অসতর্কতা পরিহার করতে হবে, জনগণকে সমস্ত শক্তি সংহত করতে হবে, যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে, শত্রুর প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্বের স্থান এখন নেই।

কাপুরুষ, ভীতু, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এবং বেইমানদের কোনও স্থান আমাদের মধ্যে নেই। পিতৃভূমি রক্ষার এই যুদ্ধে ভয় কাকে বলে আমাদের জনগণকে তা ভুলতে হবে। যে ফ্যাসিস্টরা মানুষকে দাস বানাতে চায় তাদের হাত থেকে মুক্তির যুদ্ধে নিজেদের সর্বস্ব দেওয়ার মন নিয়ে জনগণকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মহান লেনিন বলতেন — সাহস, শৌর্য, সংগ্রামে নির্ভীকতা, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সদা তৈরি মন — এগুলিই হল বলশেভিকদের শ্রেষ্ঠ গুণ।

বলশেভিকদের এই অসামান্য গুণাবলীকে এখন লক্ষ লক্ষ লালফৌজ, লাল নৌসেনা এবং সোভিয়েট জনগণের সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে এখন যুদ্ধকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য যা প্রয়োজন এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য যা প্রয়োজন— সেটাই এখন মুখ্য, বাকি সব প্রয়োজনকে গৌণ করে ফেলতে হবে। আমাদের মতো দেশ, যে দেশ সকল মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে, সেই দেশের প্রতি জার্মান ফ্যাসিস্টদের বর্বর ক্রোধ ও ঘৃণা যে কোনমতেই প্রশমিত হওয়ার নয় — সোভিয়েট জনগণ এখন তা পরিষ্কারভাবে বুঝেছে।

এই শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণকে দৃঢ়প্রত্যয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। নিজেদের অধিকার ও নিজেদের দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হবে। লালফৌজ, লাল নৌবাহিনী, সোভিয়েটের প্রতিটি মানুষ সোভিয়েট ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য লড়বে, আমাদের গ্রাম ও শহরগুলি রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেবে। আমাদের জনগণের শিরায় শিরায় বইছে যে দুঃসাহসী উদ্যোগ ও বুদ্ধিমত্তা, তার প্রকাশ ঘটাবে।

লালফৌজের পাশে আমাদের সমস্ত সহায়সম্বল নিয়ে দাঁড়াতে হবে, লালফৌজের যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের জায়গা দ্রুত নতুন নতুন মানুষ দিয়ে ভরে দিতে হবে, ফৌজের যা প্রয়োজন তার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সেনা, রসদ ও যুদ্ধসরঞ্জাম এবং আহতদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

লালফৌজের পৃষ্ঠভূমি রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং এই কাজের কাছে বাকি সব গৌণ করে ফেলতে হবে। আমাদের সমস্ত শিল্প-কলকারখানায় আরও কঠোর শ্রম দিয়ে আরও বেশি রাইফেল, মেশিনগান, কামান, বুলেট, গোলা, বিমান তৈরি করতে হবে; কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে হবে, সমস্ত এলাকায় বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদভূমিতে যারা অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে, যারা পলাতক, আতঙ্ক সৃষ্টি করে যারা গুজব ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। গুপ্তচর, বিভেদপন্থী ও শত্রুর ছত্রীসেনাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সরাসরি শত্রুসংহারে লিপ্ত সেনা ব্যাটেলিয়নগুলিকে সবরকম সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে, শত্রু অত্যন্ত ধূর্ত, নীতিহীন এবং প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারে অভিজ্ঞ। এটা সবসময় খেয়ালে রাখতে হবে এবং প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না।

আতঙ্ক ছড়িয়ে বা কাপুরুষতার জন্য যারাই প্রতিরক্ষার কাজ ব্যাহত করবে — তারা যে-ই হোক — তৎক্ষণাৎ তাদের সামরিক ট্রাইবুনালের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কোথাও লালফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে, সেখান থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন সরিয়ে নিতে হবে, যাতে একটিও রেলইঞ্জিন, একটিও রেলগাড়ী শত্রুর হাতে না পড়ে, এক পাউন্ড শস্য, এক গ্যালন পেট্রলও যেন তারা না পায়।

যৌথ খামারের চাষীরা অবিলম্বে সমস্ত গবাদি পশু সরিয়ে দিন এবং সমস্ত ফসল ফ্রন্টের পিছনে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিন। ধাতু, শস্য এবং জ্বালানি তেল সহ সমস্ত সম্পদ যা সরানো যাবে না, তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর অন্যথা যেন কোনমতেই না হয়।

শত্রু কবলিত এলাকায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য, শত্রুকে ভুল পথে চালনা করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। সর্বত্র গেরিলা হানাদারি চালিয়ে যেতে হবে। সেতু, রাস্তা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন উড়িয়ে দিতে হবে। অরণ্য, গুদাম, যানবাহন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শত্রুকবলিত এলাকায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শত্রু ও তার সহযোগীরা সেখানে তিষ্ঠতে না পারে। পদে পদে তাদের ঘেরাও করে মেরে শেষ করে দিতে হবে। শত্রুর সমস্ত কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে হবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে এই যুদ্ধ একটা সামান্য যুদ্ধ নয়। এটা কেবলমাত্র দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধ।

ফ্যাসিস্ট উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে জড়িত করে আমাদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশের সামনে দেখা দেওয়া গভীর বিপদ দূর করাই নয়, জার্মান ফ্যাসিবাদী জাঁতাকলে পিষ্ট সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাও আমাদের লক্ষ্য।

এই মুক্তিসংগ্রামে আমরা একা নই। ইউরোপ, আমেরিকার জনগণ, এমনকী হিটলারি স্বৈরাচারীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ জার্মান জনগণের মধ্য থেকেও আমরা বিশ্বস্ত মিত্র পাবো। আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের এই যুদ্ধ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে আছে। এটা হবে জনগণের একটি যুক্তফ্রন্ট, যা দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং হিটলারি ফ্যাসিস্ট সেনার হাতে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ার বিপদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়বে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের এবং আমেরিকার ঘোষণার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যায়। এই সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা সোভিয়েট জনগণের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জাগিয়েছে।

কমরেডস্, আমাদের শক্তি অপরিমেয়। এ সত্যটা অচিরেই গর্বোদ্ধত শত্রুপক্ষ বহু মূল্য দিয়ে বুঝতে পারবে। আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে লালফৌজের পাশে দাঁড়াতে বহু হাজার শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছে। সোভিয়েটের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাশক্তি রূপে জেগে উঠবে।

মস্কো এবং লেনিনগ্রাদে মেহনতি মানুষ ইতিমধ্যেই লালফৌজের সাহায্যের জন্য জনগণের দানে এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। শত্রুর হানাদারির সম্মুখীন এমন সমস্ত শহরেই জনগণের দানে এমন ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে আমাদের দেশ, আমাদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, সমস্ত মেহনতি মানুষকে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের সকল শক্তিকে সমবেত ও সংহত করার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং যে বিশ্বাসঘাতক শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে তাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করার জন্য একটি স্টেট কমিটি অব ডিফেন্স গঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রের সমগ্র ক্ষমতা এই কমিটির হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে।

স্টেট কমিটি অব ডিফেন্স কাজ শুরু করেছে এবং শত্রুর বিনাশ ও আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য লালফৌজ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার শপথ নিয়ে লেনিন-স্ট্যালিনের পার্টিও সোভিয়েট সরকারের পিছনে দাঁড়ানোর জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। আসুন, সমস্ত শক্তি নিয়ে আমরা বীর লালফৌজ, মহান লাল নৌবাহিনীর পাশে দাঁড়াই, শত্রুর বিনাশে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করি।

এগিয়ে চলুন, জয় আমাদেরই!

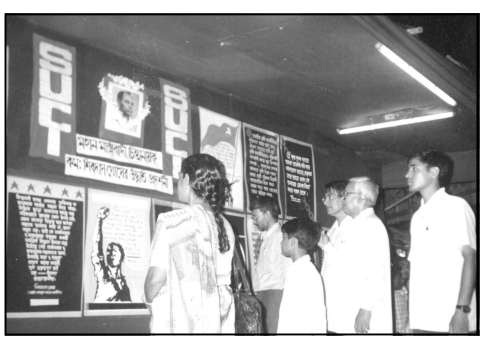

দক্ষিণ দিনাজপুর

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

গত ৯ থেকে ১১ এপ্রিল বালুরঘাট শহরে এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, সত্যিকারের বিপ্লবী দল গঠনের প্রক্রিয়া, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রক্রিয়া — এককথায় জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে যে সমস্ত মূল্যবান শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন তারই কিছু অংশ এই প্রদর্শনীতে পরিবেশিত হয়।

৯ এপ্রিল এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড সাগর মোদক। তিনদিনই উদ্ধৃতি প্রদর্শনীতে বহু মানুষ উপস্থিত হন এবং সংলগ্ন বুকস্টল থেকে পার্টির প্রকাশিত বইপত্র কেনেন।

নদীবাঁধ ভাঙ্গন প্রতিরোধ সহ ১৫ দফা দাবিতে কাকদ্বীপ এস ডি ও অফিস অভিযান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকের নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে নির্মাণ, সাহারা চুক্তি বাতিল; স্বাস্থ্য-পরিষেবা-শিক্ষা-রাস্তাঘাটের উন্নয়ন; গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স ও খাজনা, নারী নির্যাতন, মদ-জুয়ার প্রসার রোধ প্রভৃতি দাবিতে গত ১৩ মে প্রায় দু-হাজার মানুষ কাকদ্বীপ এস ডি ও এবং ইরিগেশন দপ্তর অভিযান করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয় পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি।

সুন্দরবন বাঁচাতে কাকদ্বীপ কনভেনশনের আহ্বান

সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ শহরে গত ১৩-১৪ মে হাজার হাজার মানুষের এক বিশাল গণ-কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও জমি মিলিয়ে ৯০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সাহারা কোম্পানির হাতে ট্যুরিজমের জন্য তুলে দেওয়ার যে চুক্তি সিপিএম সরকার করেছে, যার ফলে ইতিমধ্যেই জমি থেকে পাট্টাদার ও মালিক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, সেই কালাচুক্তি বাতিলের দাবিতে এই গণকনভেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল থেকে ছাত্র যুবক কৃষক খেতমজুর ও মা-বোনেরা দৃপ্ত মিছিল সহকারে এই কনভেনশনে যোগ দেন। 'সুন্দরবন লুণ্ঠন চুক্তি অবিলম্বে বাতিল কর' ধ্বনিতে কাকদ্বীপ শহর মুখরিত হয়ে ওঠে। বিকালে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সমাবেশে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক শিক্ষক নেতা প্রহ্লাদ পুরকাইত। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, শ্রমিকনেতা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রখ্যাত প্রযুক্তি ও পরিবেশবিদ চির দত্ত তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, আমরা সাধারণত জনবিচ্ছিন্নভাবে ঘরের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় আলাপ-আলোচনাতেই অভ্যস্ত। প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে অভ্যস্ত নই। এই সমাবেশের সামনে বলতে গিয়ে তাই রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বিকালে এখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সুন্দরবন রক্ষার শপথ নিয়ে দৃপ্ত মিছিল সুন্দরবনের নানা এলাকা থেকে আসছে, বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল। তিনি বলেন, সাহারার ট্যুরিজম পরিকল্পনা জনস্বার্থবিরোধী। রাজ্যের একদিকে এইসব বহুজাতিক কোম্পানি, অন্যদিকে প্রোমোটারের রাজত্ব। সরকার সুন্দরবনকে বড়লোকদের টাকা রোজগারের মৃগয়াক্ষেত্র বানাচ্ছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, জৈব বৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবিকা আজ বিপন্ন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, মা-বোনেরাও দা-খন্তা নিয়ে তৈরি থাকুন, এইসব কোম্পানির এজেন্টরা ভিটেমাটি থেকে আপনাদের উচ্ছেদ করতে এলে রুখে দাঁড়ান; 'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ' আমরা আপনাদের পাশে আছি।

রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার মনোজ কুমার সাহা বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলের বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এর ম্যানগ্রোভ অরণ্য, এর পশুপাখি ও পতঙ্গ, এর নদী-সমুদ্র, এর মানুষ — এই যে বৈচিত্র্য — এগুলোর প্রত্যেকটিই আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে হিসেবে রেখে তবেই সুন্দরবন উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে। ইকো-ট্যুরিজমের কথা সরকার বলছে, কিন্তু সেটা কী — তা কিন্তু বলছে না। ইকোট্যুরিজমের অর্থ জৈব বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখে ট্যুরিজম। তা কিন্তু সাহারা করতে যাচ্ছে না। জৈব বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে ট্যুরিজমের মাধ্যমে মুনাফা করতে তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনাদের প্রস্তুতিকে অভিনন্দন জানাই।

রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পীযূষ কান্তি ঘোষ বলেন, আমি কুলতলীর হুকাহারানিয়া গিয়েছিলাম। উন্নয়নের নামে একটা জীবন্ত নদীকে কী বীভৎস ভাবে খুন করা হচ্ছে দেখে এলাম। সুন্দরবনে সাহারাকে দিয়ে নাকি শিল্পায়ন হবে! ওরা আসলে নদী, অরণ্য, জৈব বৈচিত্র্য — সবকিছুকে খুন করবে। আপনারা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন দেখে আমরা খুশি হয়েছি। আমরা আপনাদের পাশে আছি।

সাংবাদিক পীযূষ চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার সাহারা কোম্পানির সাহায্যে সুন্দরবনকে সাহারা মরুভূমি বানাতে চলেছে। আপনারা যেভাবে প্রতিরোধের সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, যেভাবে জনজাগরণ ঘটতে দেখছি, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একে আপনারা প্রতিরোধ করতে পারবেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, সুন্দরবনবাসীর জীবনে সাহারা চুক্তির প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক। সুন্দরবন ধ্বংস হলে তার লাগোয়া কলকাতাও রেহাই পাবে না। সাহারা চুক্তি অনুযায়ী কুলতলীর কৈখালিতে জমি থেকে পাট্টাদার ও জমির মালিকদের উচ্ছেদের নোটিশ জারি হয়েছে, সাগরদ্বীপের লাইট হাউস এলাকায় জমি কেনা-বেচার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ওরা জল-জমি-জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করে আমাদের যাযাবরের জীবনে ঠেলে দেবে, ভিখারি বানাবে। মৎস্য শিকারের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় দশ লক্ষ মানুষের উপরও আক্রমণ শুরু হয়েছে। ওরা আমাদের মাছ-কাঁকড়া ধরার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। সুন্দরবনের নদী-সমুদ্রে সুন্দরবনবাসী আর পা দিতে পারবে না। মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ঈশ্বরের কাছে, আল্লার কাছে কাঁদলে রেহাই মিলবে না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে হবে। আসুন, প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার করে গড়ে তুলি, একমাত্র তাহলেই আমরা এই আক্রমণ রুখে দিতে পারবো।

ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সহ-সভাপতি ডঃ শুভাশিস মাইতি বলেন, সরকার যদি সুন্দরবনের উন্নয়ন চাইত, তাহলে সুন্দরবনবাসীর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে সমস্যা, তার সমাধানের ব্যবস্থা করত। তা না করে তারা দেশি-বিদেশি ধনী ট্যুরিস্টদের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে, বাঘ-কুমীর-সাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে, লোনাজলের দাপট প্রতিহত করে জমিকে কৃষিযোগ্য করেছে। সেই সুন্দরবনকে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে বেচে দিচ্ছে সরকার। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও জোরদার করা দরকার।

সভাপতির ভাষণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রবীণ অধ্যাপক শশধর পুরকাইত বলেন, সরকার যে এভাবে আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে তা আমরা আগে বুঝতে পারিনি, অন্ধকারে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, কী সর্বনাশ হতে চলেছে! সাহারা কোম্পানি যে ট্যুরিজম ব্যবসা করতে চলেছে, তাতে আমাদের গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুঠ হয়ে যাবে। আমরা কি এ জিনিস মেনে নেবো? না — আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমরা তা মেনে নেব না। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে আমরা যখন লড়াই করেছি তখন আমরা সুখী ভারতের স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। এখন আমাদের সুখ স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে; এখন শুধু দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমরা পশু নই, মানুষ। অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করতে পারে মানুষই। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা শপথ নিয়েছিলাম 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। সুন্দরবনকে বাঁচাতে আজ আমাদের আবার সেই শপথ নিতে হবে। তিনি বলেন, আপনাদের প্রতিবাদী মানসিকতা ও প্রস্তুতি দেখে আনন্দ লাগছে। বুঝতে পারছি — প্রতিরোধ হবেই। আজ শুভদিন, সংগ্রামের জন্য আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করছে সুন্দরবনবাসী। আপনাদের প্রতিরোধ সমাবেশ দেখে জীবন আমার সার্থক।

প্রকাশ্য সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাউথ সুন্দরবন মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক নীলরতন হালদার এবং পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটির সভাপতি ফণিভূষণ গিরি।

পরদিন ১৪ মে প্রতিনিধি অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানে ভারতের অন্যতম শীর্ষ সম্মান ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী, খড়্গপুর আই আই টি'র অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী। তিনি বলেন, পৃথিবীর যে কয়েকটি অঞ্চল বিশ্ব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে তাদের মধ্যে সুন্দরবন অন্যতম। তাই সুন্দরবন রক্ষা পেলে বিশ্ব একটা বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা আজ তাকিয়ে আছেন সুন্দরবনের দিকে, সুন্দরবনের মানুষ কীভাবে সর্বনাশ রোখে — তার দিকে। সেজন্য আপনাদের সংগ্রামের প্রস্তুতিকে বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, সাহারার যে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প তাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস না হয়ে উপায় নেই; প্রকৃতিকে তারা ধ্বংস করবেই। সরকার বলছে — এর ফলে নাকি মানুষের উন্নয়ন হবে; আসলে উন্নয়নের নামে ওরা যা করতে চাইছে তার তলায় চাপা পড়ছে সাধারণ মানুষ। থাইল্যান্ড সরকারও মানুষের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্যুরিজম শিল্প গড়ে তুলেছিল। তারও ছিল বিরাট ম্যানগ্রোভ অরণ্য। উন্নয়নের জন্য সব কেটে সাফ করে দিয়েছে। উন্নয়ন হয়েছে — চকচকে রাস্তা, ঝকঝকে গাড়ি হুসহুস করে ছুটছে, পাঁচতারা-সাততারা সুদৃশ্য হোটেল, ধনী পর্যটকদের ভিড়। কিন্তু থাইল্যান্ডের সাধারণ মানুষ সেখান থেকে বিতাড়িত, তাদের ঘরে ঘরে হাহাকার — কাজ নেই; বহু বাড়িতে একমাত্র রোজগারের লোক মেয়েরা। হোটেলে হোটেলে নারী মাংসের যোগান দিতে এজেন্টরা এদের সংগ্রহ করে আনে। ট্যুরিজমের ফলে উন্নয়নের এই হল চেহারা। সুন্দরবন এলাকায় এই উন্নয়নের জন্য চুক্তি করেছে রাজ্য সরকার ও সাহারা কোম্পানি। এরা মানুষের শুধু জীবনজীবিকা ধ্বংস করবে তাই নয়, আপনাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশও ধ্বংস করে দেবে। তারা এমন সব কদর্য কালচারের আমদানি করবে তাতে সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় গড়ে ওঠা আপনাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের ছেলেমেয়েদের 'কালচার' এমন বদলে যাবে যে, ১০-১৫ বছর বাদে তাদের দেখে চিনতে পারবেন না।

প্রকাশ্য সমাবেশের শেষে সভামঞ্চেই 'বিজ্ঞান তৃষ্ণা' সংস্থা সাহারা কোম্পানির সম্ভাব্য আক্রমণের বিষয়গুলিকে তুলে ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি নাটক পরিবেশন করে। প্রতিনিধি অধিবেশনে ৩৫ জনের 'সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছে এবং পরিবেশবিদ চির দত্ত প্রধান উপদেষ্টা, প্রবীণ অধ্যাপক শশধর হালদার সভাপতি ও শিক্ষকনেতা প্রহ্লাদ পুরকাইত সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

বিশ্বব্যাঙ্কের করাল গ্রাসে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জনগণ দায়মুক্তি দেবেনা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ-এর উদ্যোগে গত ১৯ মে '০৫ বিকালে বিশ্বব্যাঙ্ককে দায়মুক্তি দেওয়ার চক্রান্ত ও রূপালী ব্যাঙ্ক বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। তোপখানা রোডস্থ দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ সরকার ও ঢাকা মহানগর সমন্বয়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে বিশ্ব সুদখোর মহাজনী সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ককে দায়মুক্তি দেওয়ার চক্রান্ত করছে। এই বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ-সাহায্যের জন্য তাদের পরামর্শ ও শর্ত মেনে নতজানু শাসকশ্রেণী দেশের শিল্প-কৃষি ধ্বংস করে চলেছে। আদমজীর মত পাটকল বন্ধ করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শেই ফ্লাড এ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে জলের অবাধ প্রবাহে বাধা দিয়ে স্থায়ীভাবে বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এই কিছুদিন আগেই বিশ্বব্যাঙ্ক স্বীকার করেছে, তাদের ভুল পরামর্শে ও পরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ খাতে ১৩ হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। এ সকল অপকর্মের পর এখন তারা দায়মুক্তি চাইছে যাতে এই হাজার হাজার কোটি টাকার অপচয় ও ক্ষতির ফলে কেউ বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে না পারে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই বিশ্বব্যাঙ্ক একদিকে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চিৎকার করছে, অপরদিকে তারা নিজেদের আইনের উর্ধ্বে রাখার জন্য দায়মুক্তি চাইছে। এর ফলে বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাসমূহের তথাকথিত গণতন্ত্রের চেহারা আজ উন্মোচিত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যখন বিশ্বব্যাঙ্ক দায়মুক্তি চাইছে তখনই বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে ৫০০ কোটি টাকার রূপালী ব্যাঙ্ক ৬১ কোটি টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। অথচ রূপালী ব্যাঙ্ক লাভজনক প্রতিষ্ঠান। গত বছরও ৩৬ কোটি টাকা লাভ করেছে এই ব্যাঙ্ক। তাসত্ত্বেও এই বিরাষ্ট্রীয়করণ কার স্বার্থে?

নেতৃবৃন্দ বলেন, শুধু রূপালী ব্যাঙ্ক নয়, তথাকথিত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য ঋণ প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে অগ্রণী, জনতা, সোনালী ব্যাঙ্কেও বিদেশি উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের কৃষিও আজ বিশ্বব্যাঙ্কের করাল গ্রাসে ক্ষত-বিক্ষত। শিক্ষা ব্যবস্থাও বিশ্বব্যাঙ্কের শ্যেন দৃষ্টিতে। ফলে শাসকশ্রেণী আজ শিক্ষা ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়ে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে চলেছে। এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের জন্য দেশিয় শাসক লুটেরা গোষ্ঠী যেমন দায়ী, পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফও সমভাবে দায়ী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বব্যাঙ্কের দায়মুক্তি বিল পাশ হলে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। ফলে সকল দেশপ্রেমিক জনগণ ও বাম প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা আহ্বান জানান।

ডি এ ফেরত কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া

একের পাতার পর

আর্থিক বঞ্চনার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে এবং এভাবে একটির পর একটি অধিকার অবলীলায় কেড়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই ডি-এ ফেরত আন্দোলনে কর্মচারীদের বিপুল অংশগ্রহণ রাজ্য সরকারকে এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

রি-ডিপ্লয়মেন্টের নামে চাকরির নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সহ ঠিকা ও চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল, মৃত ও অক্ষম কর্মীর পোষ্যের চাকরির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বেতন সংশোধন, ৫০ শতাংশ ডি-এ মূল বেতনে যুক্ত করা, বকেয়া সহ ডি-এ প্রদান ইত্যাদি দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) একটির পর একটি আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বারবার দেখানো হয়েছে যে, অন্যান্য বহু রাজ্য সরকার, যেমন বিহার, আসাম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এমনকী ত্রিপুরাও কর্মচারীদের বকেয়া সহ ডি-এ দেয়, কেন্দ্রীয় সরকারও দেয়। ইতিমধ্যে বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গোয়া, উত্তরাঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা মূল বেতনে যুক্তও করেছে। এর ফলে ৩ হাজার ও ৫ হাজার টাকা মূল বেতনের একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ পদের একজন সরকারি কর্মচারীর চেয়ে যথাক্রমে ২ হাজার ও ৩ হাজার টাকা বেশি পান। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''রাজ্য বাজেটে কর্মচারীদের জন্য সুখবর থাকবে।'' এই অবস্থায় যখন রাজ্য সরকারি কর্মীরা ৩৩ মাস ধরে ডি-এ থেকে বঞ্চিত এবং মোট ১৮ শতাংশ ডি-এ বাকি, তখন এপ্রিল মাস থেকে মাত্র ৩ শতাংশ ডি-এ দেওয়ার ঘোষণায় কর্মচারীরা প্রতারিত ও অপমানিত বোধ করেন। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরাই সংগঠনের কর্মীদের কাছে প্রস্তাব দেন, 'ভিক্ষার সামিল ৩ শতাংশ ডি-এ ফেরত দেওয়া হোক।' কর্মচারীদের দাবির সাথে সহমত হয়ে কর্মচারী সংগঠন ডি-এ প্রত্যাখ্যান করার কর্মসূচি ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে তৎকালীন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব ২ টাকা মহার্ঘভাতা ফেরত দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন, কর্মচারীরাও তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। আন্দোলনের চাপে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার মহার্ঘভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এবার সেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বকেই দেখা গেল, ডি-এ ফেরত দেওয়ার কর্মসূচির প্রকাশ্যে বিরুদ্ধতা করতে, সরাসরি বাধা দিতে।

এবার ডি-এ ফেরত কর্মসূচি কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। ২ মে কলকাতার জি-পি-ও, রাইটার্স বিল্ডিংস পোস্ট অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট পোস্ট অফিস, আলিপুর, নিউমার্কেট, বেলেঘাটা, সেচভবন প্রভৃতি পোস্ট অফিসে অফিস শুরুর পরপরই ডি-এ ফেরত দেওয়ার জন্য সরকারি কর্মীদের লাইন পড়ে যায়। 'বঞ্চনার প্রতিবাদে এপ্রিল '০৫ থেকে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ফেরত দিচ্ছি' — এই বয়ানে কয়েক হাজার মানিঅর্ডার ফর্ম জমা পড়ে প্রথম দিনেই। কলকাতার পোস্ট অফিসগুলি ছাড়াও, জেলাগুলির পোস্টঅফিস থেকেও ৬ মে পর্যন্ত মানিঅর্ডার করা হতে থাকে। আরএসপি দল প্রভাবিত জয়েন্ট কাউন্সিলভুক্ত কর্মচারীরা সহ সিপিএমের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য বহু কর্মচারী টাকা ফেরত পাঠান। 'কর্মচারী সংহতি' নামে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের একটি গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সমর্থনে লিফলেট দেয়, পোস্টারিং করে। নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মত জেলায় বহু সাধারণ কর্মচারী নিজস্ব উদ্যোগেই এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। মুর্শিদাবাদ, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলাতে একই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কর্মচারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছে, কর্মীদের ভয় দেখিয়েছে। পাশাপাশি কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করতে তারাও বকেয়া ডি-এ'র দাবি তুলে আন্দোলনের ভান করতে থাকে। কিন্তু এরপরও যখন সংগঠনের সদস্য-কর্মচারীদের কাছ থেকে বহু প্রশ্নের মুখে নেতৃত্বকে পড়তে হয়েছে, তখন তারা প্রকৃত আন্দোলনকে সরাসরি বাধা দেওয়ার কাজে নেমে পড়ে। সল্টলেকের বিকাশ ভবন, রাইটার্স বিল্ডিংস সহ বিভিন্ন জেলায় তারা একাজ করেছে।

এতসব করেও কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা যখন দেখলেন কর্মচারীদের আটকাতে পারছেন না, তখন কর্মসূচির প্রথম দিনে তাঁরা নবপর্যায়ের কর্মী সৌমেন বসু, সোমনাথ ভট্টাচার্য, সাধন ঘোষ, অলকরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন।

৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ফেরত দেওয়ার কর্মসূচিকে এস ইউ সি আই সমর্থন জানিয়েছিল। এ সম্পর্কে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য ২ মে যখন লিফলেট আকারে এস ইউ সি আই কর্মীরা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিলি করছিলেন, তখন কো-অর্ডিনেশন কমিটির কিছু কর্মী, তাদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরীর অঙ্গুলিহেলনে এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, লিফলেট কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়। খাদ্য ভবনের এই ঘটনায় এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড তপন মুখার্জীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। মহাকরণ পোস্ট অফিসে কর্মচারীদের বিরাট লাইন পুলিশ দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। পুলিশ হুকুম জারি করে—এমনকী পোস্টার দেখানোও চলবে না ! কিন্তু কর্মচারীদের প্রবল প্রতিরোধে পুলিশ শেষপর্যন্ত পিছিয়ে যায়।

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (জেপিএ)-এর রাজ্য সম্পাদক তারক দাস নবপর্যায়-এর যুগ্ম সম্পাদক সমীর রঞ্জন মজুমদারের সাথে দেখা করে জানান যে, রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়ে তাঁদের সংগঠনের কিছু সদস্যও প্রতীকীভাবে ডি-এ ফেরত দিচ্ছেন। সরকারি-আধা সরকারি-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ 'যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানানো হয়। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গণছুটি বা ধর্মঘটের মতো বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে নবপর্যায়ের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বিধ্বস্ত ময়ূরেশ্বরে সর্বস্বান্ত চাষীরা ত্রাণের দাবিতে সোচ্চার

গত ৫ মে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকের ৭৫ শতাংশ অর্থাৎ শতাধিক মৌজার বোরো ধান ও তিল সহ অন্যান্য ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায় এবং শত শত গরিব মধ্যবিত্ত চাষীর ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ায় এক মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার সর্বস্বান্ত ঋণগ্রস্ত চাষীর ঘরে নেমে আসে শোকের ছায়া। এমতাবস্থায় এই ব্লকের এস ইউ সি আই দলের যুবকর্মী, চাষী ঘরের সন্তান কমরেড লুৎফর রহমান (বাবু) ছুটে যান ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর ঘরে ঘরে। ত্রাণ সহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, কৃষিঋণসহ জমির খাজনা মকুব, বিদ্যুৎ বিল মকুব, বিনাসুদে কৃষিঋণ, মিনিকিট ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে 'কৃষক সংগ্রাম সমিতি' গড়ে তোলেন এবং তার পতাকাতলে সংগঠিত করেন ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার চাষীকে। অসহায় চাষী নতুন করে বাঁচার ভরসা পায়। সিপিএম এর ভীতিপ্রদর্শন, মিথ্যা প্রবঞ্চণা ও আন্দোলন ভাঙার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে ১০ মে সহস্রাধিক চাষী সামিল হন মল্লাপুর শহরস্থিত বিডিও অফিসের বিক্ষোভ ডেপুটেশনে। বাজার পরিক্রমাকালে স্লোগান মুখরিত মিছিলের কলেবর ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিডিও অফিস চত্বরে এক বিরাট সমাবেশের সৃষ্টি হয়। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর বীরভূম জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ রফিকুল হাসান ও বৈদ্যনাথ মাল। এরপরে ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লক কৃষক সংগ্রাম সমিতি-র সম্পাদক কমরেড লুৎফর রহমান ও সভাপতি নন্দলাল বসুর যৌথ নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বিডিওর নিকট ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আন্তরিকতা প্রকাশ করেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বিজেপি সরকারের দুর্নীতি ফাঁস

একের পাতার পর

কোটি টাকা। অথচ আদায় হয়েছে তার থেকে ৬০০৬ কোটি টাকা কম। বলা বাহুল্য বৃহৎ পুঁজির কল-কারখানার মালিকরাই নানা অছিলায় এই কর ফাঁকি দিয়েছে।

'ভারত উদয়' ছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সাধের সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্প সম্পর্কেও নানা অভিযোগ তোলা হয়েছে সি এ জি রিপোর্টে। বলা হয়েছে, সরকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণে আদৌ সচেষ্ট ছিল না। এই প্রকল্প নিয়ে যতখানি হইচই করা হয়েছে, সেই তুলনায় কাজ হয়েছে খুবই কম। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০০৪-এর জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৬৩৫০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণের। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকার যে আদৌ আন্তরিক ছিল না, তার প্রমাণ হল, এই পর্যায়ে মাত্র ১৮৫০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৭৫টি বড় জাতীয় সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে মাত্র ৫৭টি'র কাজ শেষ হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০০৪-এ মাত্র ২৯ শতাংশ কাজ হয়েছে। বাকি কাজ এ'বছরের মধ্যে শেষ করার কথা। এই গাফিলতির জন্য সামগ্রিক ব্যয় বেড়ে যাবে বিপুল পরিমাণে। সকলেরই স্মরণে আছে, এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি (এন এইচ এ আই)-এর তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্র দুবে। প্রকল্পে যে মালমশলা ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বাজপেয়ীকে চিঠিও লিখেছিলেন। সি এ জি রিপোর্টেও কাজের মান খারাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিকাদারদের যোগ্যতা বা তারা কেমন কাজ করছে, কিছুই যাচাই করে দেখেনি এন এইচ এ আই। প্রকল্পটিতে বড় সংস্থাগুলি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ছোট সংস্থাগুলিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে বলে সি বি আই আগেই জানিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখার পরই খুন হন সত্যেন্দ্র দুবে।

দেশের ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ যেখানে পুঁজিবাদী নির্মম শোষণে প্রতিদিন নিষ্পেষিত হচ্ছে, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে তাদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে অর্জিত সরকারি কোষাগারের টাকা খরচে চূড়ান্ত অপব্যয়, দুর্নীতি এবং অনৈতিকতার যে নজির সি এ জি তার রিপোর্টে তুলে ধরেছে, তা এক কথায় ভয়াবহ। যখন রাজকোষে অর্থাভাবের কথা বলে হয় কথায় নয় কথায় করভারে ন্যুব্জ সাধারণ মানুষের উপর সরকার একের পর এক বাড়তি ট্যাক্স চাপিয়ে চলেছে, তখনই দেখা যাচ্ছে, হাজার হাজার কোটি টাকার বিপুল অঙ্কের ট্যাক্স দেশের ধনী এবং বৃহৎ পুঁজির মালিকদের কোনরকম সরকারি নীতি ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপোষণে হাজার হাজার কোটি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। অথচ এর একটা ভগ্নাংশ পরিমাণ অর্থ খরচ করলেও দেশের কোটি কোটি শিশুকে অপুষ্টি এবং অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা যেত। এর একাংশ টাকা খরচ করলেই দেশের হাসপাতালগুলি থেকে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিতে হত না। কিন্তু এর কিছুই হয়নি সরকারের পুঁজিপতিতোষণকারী নীতি, চরম দুর্নীতি ও স্বজপোষণের কারণে। এক্ষেত্রে বিজেপি, কংগ্রেস, সি পি এম বা আঞ্চলিক বুর্জোয়া নানা দল — সকলেরই চরিত্র এক। এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এরা সকলেই পুঁজিপতি-মালিকশ্রেণীর প্রতি দারুণ রকমের উদার। আর সাধারণ মানুষের প্রতি ততখানিই কঠোর, নির্মম। দুর্নীতি-স্বজনপোষণে এরা কেউ কারোর থেকে কম নয়। যে যখনই সরকারে থেকেছে, কেউই এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। দেশের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এইসব দলের নেতারা অহরহ উপদেশ দেন, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ একদিন আসবেই। সাধারণ মানুষ জানেন, স্বাধীনতার পর ছ'দশক কেটে গেছে, বিশ্বায়নেরও দেড় দশক অতিক্রান্ত। সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ আসা তো দূরের কথা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, করের বোঝা তাদের জীবনকে জেরবার করে দিচ্ছে। অপরদিকে সরকারের স্তরে স্তরে দুর্নীতি ছেয়ে যাচ্ছে।

কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসন দেখিয়েই বিজেপি দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা দেশের মানুষকে সুশাসন দেবে, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবে। বলেছিল, বিজেপি অন্য ধরনের পার্টি। বাস্তবে কংগ্রেসের সাথে তাদের যে কোনও পার্থক্য নেই, তা অতীতে তহলকা কেলেঙ্কারি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও অস্ত্রক্রয় কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত সি এ জি রিপোর্ট তাকে আরও নির্দিষ্টভাবে দেশের মানুষের কাছে দেখিয়ে দিল। কেন্দ্রের ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে এসেছে দুর্নীতিগ্রস্ত নীতিহীন সেই কংগ্রেস ; এ রাজ্যে সি পি এমের দুর্নীতি আজ তার শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রতিটি দেশে এই দুর্নীতি আজ চরম আকার ধারণ করেছে। যারাই পচে গলে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবা করবে, তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে, তারাই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবে। পুঁজিবাদ যত গভীর সঙ্কটে পড়ছে, ততই সে একদিকে যেমন আরও বেশি বেশি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হচ্ছে, তেমনি দেশের জনসাধারণের একাংশকেও সে এর মধ্যে যুক্ত করে ফেলছে। বিশ্বায়ন এবং দুর্নীতি আজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। পুঁজিবাদ আজ এমন একটা সঙ্কটে পড়েছে যে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে উৎপাদন করার ক্ষমতা তার বেড়েছে কিন্তু মানুষের ক্রমক্ষমতা ক্রমাগত কমছে। এই অবস্থায় দুর্নীতির রাস্তায় পুঁজিবাদী দলগুলির সাহায্যে সরকারি নীতিকে সুবিধামতো বদলানো, বুর্জোয়া ব্যবস্থার পুরনো নীতিগুলির মধ্যে যতটুকু সামাজিক দায়দায়িত্বের স্বীকৃতি আছে তা ঝেড়ে ফেলা, ন্যূনতম মজুরি আইন ও শ্রম আইন লংঘন, শেয়ার বাজারের ফাটকা, সরকারি তহবিলের টাকা, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্সের টাকা আত্মসাৎ আজ দুনিয়ার সব পুঁজিবাদী দেশের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলিও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আজ দুর্নীতি বিশেষ পুঁজিপতি বা বিশেষ রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিচরিত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নয়, এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আজকের পুঁজিবাদ টিকে থাকার তাগিদে প্রতিমুহূর্তে দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যবস্থাকে ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভের হাত থেকে বাঁচাতে পুঁজিবাদ পরিকল্পিতভাবে জনগণের নৈতিক মানকে টেনে নামাচ্ছে, জনগণকেও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। সরকারে যেই যাক, ক্ষমতাসীন দল দুর্নীতি করবেই, এটা স্বাভাবিক — এভাবেই জনগণ যাতে দুর্নীতিকে মেনে নেয় সেই চেষ্টাই সর্বাত্মকভাবে চলছে। জনগণকে বুঝতে হবে — সমস্ত দুর্নীতির আসল উৎস হল পুঁজিবাদ। তাই পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে শুধু সরকার বদলের দ্বারা দুর্নীতির অবসান ঘটানো যাবে না। একমাত্র পুঁজিবাদ উচ্ছেদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতিবিরোধী গণআন্দোলনই অবাধ দুর্নীতির উপর লাগাম পরাতে পারে।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের

১৪, ৩৮, ৫১, ৭১, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ১০২, ১১৬, ১২৩, ১২৫, ১২৬,১২৯, ১৩০, ১৩৬ — এই ওয়ার্ডগুলিতে এই চিহ্নে

এবং ৬৯ নং ওয়ার্ডে এই চিহ্নে

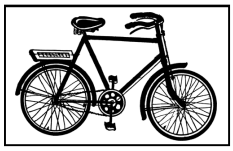

ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন

বিদ্যুৎশিল্পে ধর্মঘট প্রত্যাহার একটি চরম বিশ্বাসঘাতকতা

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বিদ্যুৎ শিল্পে ধর্মঘট প্রত্যাহারের নিন্দা করে গত ১৮ মে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ —

"বিদ্যুৎশিল্পের ধর্মঘটের নেতৃত্ব যে কাণ্ডজে বাঘ ছাড়া আর কিছু নয়, ধর্মঘট প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎআইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন আশ্বাস তো দূরের কথা এমনকী বিদ্যুৎশিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি বন্ধ, পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি প্রয়োগ বন্ধ নিয়ে কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই কেবলমাত্র পর্ষদগুলি ভেঙে দেওয়ার সময়কাল বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এতো বড় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়াকে আমরা শ্রমিক-কর্মচারী তথা জনসাধারণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করি। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছি।"

দিল্লিতে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

দিল্লির বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ ফিরোজশা কোটলায় এসে সমবেত হন। দিল্লির ওয়াজিরপুর, সোনিয়া বিহার, ভজনপুরা, সাওয়ান পার্ক, মুকুন্দপুর, শাকারপুর, ভালাস্বা, দিলশাদ বাগান, গুলাবি বাগ, করলবাগ, ত্রিনগর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানারে, প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত হয়ে দিল্লি সেক্রেটারিয়েট অফিসের দিকে রওনা হয়। তার আগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য আর কে শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল, ও সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল ও হরিশ ত্যাগী। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে কমরেডস্ পি পি সিংহ, রামবাবু, পুষ্প চামোলি, পি কে পাণ্ডোয়ার, রাকেশ কুমার, ভানোয়ার পাল, আর কে ভাট, বিহারীলাল নির্মল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা তাঁদের ভাষণে এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ হিসাবে অবক্ষয়িত পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করে, এই পুঁজিবাদের পাহারাদার শীলা দীক্ষিত সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। কমরেড প্রতাশ শামলের নেতৃত্বে কমরেডস্ পি পি সিং, ম্যানেজার চৌরাশিয়া, নিরঞ্জন লাল, রাজেশ কুমার এবং সোরন সিং আজাদ স্মারকলিপি প্রদান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

নামখানায় পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

পানীয় জলের টিউবওয়েল দীর্ঘদিন অকেজো। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন নীরব। পানীয় জল আনতে হচ্ছে অনেক দূর থেকে। এজন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দ্রনগর গ্রামের ১লা ঘেরির মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। কিন্তু পথ কোথায়? এগিয়ে এলো মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামখানা শাখা। তাদের উদ্যোগে অসুবিধায় পড়া মানুষজন সংঘবদ্ধ হয়ে ৫ মে মিছিল করে গেলেন বিডিও অফিসে। মেয়েদের কাঁখে খালি কলসী। দাবি — পানীয় জল চাই। অন্য মিটিং-এ ব্যস্ত বিডিও জানালেন তিনি পরে তাদের কথা শুনবেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামের মানুষজন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, পূর্বোক্ত মিটিং বন্ধ করে তিনি বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং এক মাসের মধ্যে এলাকায় টিউবওয়েল বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in